গুঞ্জন

গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন
গুঞ্জন

গ্রীষ্মের প্রখর তপন তাপে প্রকৃতি ধীরে ধীরে যেন এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হচ্ছে। প্রকৃতির এইরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী একমাত্র মানবজাতি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, গত বছর থেকে তাপমাত্রা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২০২৭ সালের মধ্যে চরমতম রূপ ধারণ করবে। তাই অদূর ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরিণতির কথা মাথায় রেখে, আমাদের বর্তমানের কার্যকলাপ - প্রকৃতির পক্ষে যা ইতিবাচক, তাই করতে হবে।

ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ৫, সংখ্যা ২
এপ্রিল ২০২৪

কলম হাতে

পিনাকী বিশ্বাস, নাহার আলম, সামিমা খাতুন, মালা মুখার্জী, প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজশ্রী দত্ত এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

@Pandulipi

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

বাংলা নববর্ষের সূচনাটা সুন্দর হবে বলে সকলেই আশা করেছিলাম। কিন্তু বিগত বছরের শেষ লগ্নে ঘটে গেল এক অপ্রত্যাশিত, বেদনাদায়ক ঘটনা — আমাদের সকলের পূজনীয় এবং আদরণীয় বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ২৬ মার্চ, ২০২৪-এ মর্ত্যধাম ত্যাগ করে রামকৃষ্ণলোকে চলে গেলেন। ওনার অনুপস্থিতি আমাদের বিশেষভাবে বিচলিত করেছে। ঠাকুর-মা আর স্বামীজির ভাবধারা নিয়ে যাঁরা পথ চলেন, তাঁদের পথ যে শুধু আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা কিন্তু নয়; তার সাথে মনুষ্য জন্মের যে অপর এক উদ্দেশ্য – অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম যা প্রকৃত মনুষ্য ধর্ম হওয়া উচিত – সেই পথেও চালিত করে। স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ আর সকল সন্ন্যাসী ভাইদের নিয়ে ১৯৭৮ সালে বাংলায় বন্যার সময় ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ‘মিউজিংস অফ আ মঙ্ক’ বইটি বিভিন্ন বিষয়ে ৬৮ টি নিবন্ধের একটি সংগ্রহ, এতে আধ্যাত্মিক লেখা থেকে শুরু করে ভারত এবং পশ্চিমে তাঁর বহু ভ্রমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা আছে। এই বইয়ের বাংলা সংস্করণ হল ‘স্মৃতি স্মরণ অনুধ্যান’। উনি স্থূলদেহে আর উপস্থিত না থাকলেও ভক্ত হৃদয়ে সূক্ষ্মদেহে সদা সর্বদা বিরাজমান থাকবেন।

তবে সবাইকেই প্রকৃতির নিয়মে একসময়ে স্থূলদেহ ত্যাগ

করে পরম ব্রহ্মের সাথে মিলিত হতেই হয়। আবার সময়ের নিয়মেই সেই শূন্যস্থানে অন্য একজনকে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। ঠাকুরের আশীর্বাদে রামকৃষ্ণ মিশনে সৎ, সাহসী, কর্মঠ এবং নানান গুণের অধিকারী সন্ন্যাসী মহারাজের সংখ্যা কম নয়। তাই এই বিশাল সঙ্ঘ থেকে একজন ভাবী প্রধানকে খুঁজে বার করা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

বর্তমানে বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী গৌতমানন্দজী মহারাজ সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। গৌতমানন্দজী মহারাজ একজন হাসিখুশি, সাহসী ও সহজ আন্তরিকতার মানুষ। সন্ন্যাস জীবনের পাশাপাশি জনহিতকর কল্যাণমূলক কাজেও ওনার জুড়ি মেলা ভার। মহারাজ স্বাধীনভাবে কাজ করা পছন্দ করেন। উনি আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে হাইস্কুল, হস্টেল, কারিগরী সংস্থা এবং ছোট হাসপাতাল নির্মাণ করিয়ে ছিলেন। এমন কি সেখানে যাতয়াতের জন্য সেতু তৈরির পরিকল্পনাও করেন। কিন্তু তাতে সেখানকার সক্রিয় মাওবাদী গোষ্ঠী বাধা দেয়। মহারাজ অসীম সাহসিকতার সাথে, গভীর জঙ্গলে গিয়ে সেই মাওবাদী গোষ্ঠীর সাথে কথা বলে সেতু নির্মাণের সকল বাধা প্রত্যাহার করিয়ে নেন। পরে অন্যান্য সাধুদের তিনি হাসিমুখে বলেছিলেন, “চিন্তা করোনা, তিনজন সিকিউরিটি গার্ড সঙ্গে ছিলেন, ঠাকুর মা-স্বামীজি।”

শ্রদ্ধেয় (ঈশ্বর) স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ (জন্মঃ ডিসেম্বর ২৫, ১৯২৯) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ষোড়শ সংঘাধ্যক্ষ (জুলাই ১৭, ২০১৭ – মার্চ ২৬, ২০২৪)	**শ্রদ্ধেয় স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ** (জন্মঃ ১৯২৯) রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সপ্তদশ সংঘাধ্যক্ষ (এপ্রিল ২৪, ২০২৪ এ কার্যভার গ্রহণ করেছেন)

কি সুন্দর ভাবধারা ওনার!

আশা করি নতুন বছরের আগামী দিনগুলোতে বেলুড়ের কাজকর্ম প্রণম্য মহারাজ গৌতমানন্দজীর হাত ধরে উত্তরোত্তর প্রসারিত হবে।

রামকৃষ্ণ শরণং।

জয় মা জয় মা।

জয় স্বামীজির জয়। ■

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা), সম্পাদিকা, গুঞ্জন

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

বই

নর্মদা পরিক্রমার পথে – ডাঃ অমিত চৌধুরী

প্রাপ্তিস্থলঃ জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.

কলেজ স্ট্রিট ইষ্ট, ব্লক ৪, কলকাতা ৭০০০৭৩

দূরভাষঃ +৯১ ৮০০১১ ৩২৮০৯

কলম হাতে

শুভ বাংলা নববর্ষ ১৪৩১

পথে পথে আলোর দিশা

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

আমাদের ভারতবর্ষ হল এক মহান জ্ঞান-তীর্থক্ষেত্রের জাহাজ। অর্থাৎ এই ভারতবর্ষ সেই সুদূর অতীত কাল থেকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক সুমহান পীঠস্থান। বলা যায়, যা নাই ভূলোকে, তা আছে ভূ-ভারতে। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ আদর্শ ও নীতিগত দিক দিয়ে সবার থেকে একবারে ভিন্ন। এই ভারতবর্ষ যেন সকল দেশের প্রকৃত জ্ঞানের সারমর্ম বহন করছে অনন্তকাল ধরে।

কিন্তু বর্তমান পরিবেশ ও পরিকাঠামো আমাদের নানান ভাবে ভাবিত করছে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের সেই জ্ঞান গরিমা বিকৃতি লাভ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন অবশ্যই নতুন বিশ্ব গঠনের উত্তম সোপান। কিন্তু নিজস্বতার বিস্মৃতি ঘটিয়ে প্রত্যয়িত করার যে চরম প্রয়াস শুরু হয়েছে, তা কি সত্যি সঠিক পথের দিশা দেখাবে ভবিষ্যৎগামীদের?

যদি এমন প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরা হয় — সমাজ সেটা ভালো চিন্তনের দ্বারা গ্রহণ করতে পারে, আবার কুচিন্তনের দ্বারাও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এর ফল কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে, তাই হল আজকের প্রকৃত চিন্তনীয় বিষয়।

এই ভারতবর্ষ বর্তমানে বিপুল জনসংখ্যার এক ভারবাহী জাহাজের ন্যায়। তাই এই ভার কমানোর জন্য কয়েকশো মানুষ বিপথে চালিত হয়ে অজ্ঞানতার জলে ডুব দিল কি বেঘোরে প্রাণ দিল তার হিসাব কেউ আর রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। এখন ভারতবর্ষ জাহাজের সব যাত্রী নয় ইঞ্জিনিয়ার না হয় দক্ষ নাবিক। যে যার মতো জ্ঞানের বাঁকা কম্পাস দিয়ে নতুন দিশা খুঁজছে। আর অল্পতেই দিশাহীন হয়ে জাহাজের দেওয়ালে মাথা খুঁড়ছে। আসলে কেউই প্রকৃত দিশার সন্ধান জানে না। তবে সন্ধান যে একেবারে জানে না সেটা বললে ভুল বলা হবে। এখন প্রশ্ন আসবে তাহলে সঠিকটা কি?

বর্তমান চালক সমাজ উঁচু সাইরেনের স্বরে হয়তো বলবে, আমরাই তো নানা দেশের ফর্মুলা নিয়ে একটা চলনযোগ্য (জগা খিচুড়ি) সূত্র বানিয়ে দেশের জাহাজকে তরতরিয়ে

এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে আর কি রকম প্রকৃত দিশা চাই! কিন্তু কেউ এটা লক্ষ্যই করে না যে অজ্ঞতার ঢেউয়ের ধাক্কায় ভারতবর্ষের মতো বিশালাকার জাহাজের বুকে অসংখ্য ছেদ সৃষ্টি হয়েছে। একদিন হয়তো এই ছিদ্রগুলিই এমন রূপ ধারণ করবে যে সবাই দিশাহীন হয়ে পড়বে। আর তখনি শুরু হবে প্রকৃত দিশার সন্ধান।

প্রকৃত দিশার সন্ধান ভারতবর্ষের আঁতুড় ঘরেই আছে। যুগ যুগ ধরে সাধু, সন্ন্যাসী, সিদ্ধ পুরুষ, মনীষীরা সেই আলোর দিশার সন্ধান দিয়েছেন। বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা এতোটাই দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে চলছে, যে অল্প সময়েই মানুষ ব্যর্থতা পেলে কাতর ও দিশাহীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান পরিভাষায় বলা যায় যে প্রায় সকলেই 'frustration' এ ভুগছে। আর এই রোগের হাত থেকে নিজেদের কি করে বার করতে হবে তাও সঠিকভাবে তারা জানে না বা বোঝে না। তাই বেশিরভাগ মানুষই এখন জ্ঞানী হয়েও অজ্ঞানী।

এই দিশাহীন হয়ে পড়ার প্রকৃত কারণ হল মানুষের চাহিদা। এই চাহিদার ক্ষুধা এতোটাই বেড়ে গেছে যে, বেশির ভাগ সাধারণ মানুষই আজ লোভ, লালসা, দ্বেষ, কাম ও

ক্রোধের বিকারে জর্জরিত। ধৈর্য, সততা, শান্তির পথ যে প্রকৃত দিশার সন্ধান দেয়, তা তারা ভুলে গিয়েছে। ভারতভূমি হল সকল জ্ঞানের ভিত্তি ভূমি। সকল প্রাচীন গ্রন্থঃ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে বিষয় কেন্দ্রিক যে কোনো গ্রন্থেই এক গুহ্য সারমর্ম বর্তমান আছে। সেই সারমর্ম সহজভাবে অনুধাবন করলেই প্রকৃত পথের খোঁজ পাওয়া যায় কিংবা যাবে।

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগামীরা বড্ড বেশি নকল করতে আগ্রহী। কিন্তু এর ফল একটাই হয়, সৃষ্টির নিজস্বতা হারিয়ে যায়। এটা ঠিক যে প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি আমাদের কিছু না কিছু শেখায়। এই সংস্কৃতির আদান প্রদান, উত্তম ভাবনা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে – নিজের সংস্কৃতিকে ভুলে বহিঃসংস্কৃতির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া।

প্রকৃত জ্ঞান হল আত্মার স্বরূপ অনুসন্ধান করা। অর্থাৎ কর্মময় জীবনে সঠিক ও বেঠিকের বিচার করার বিচক্ষণতা আয়ত্ত করা। মিছে আলেয়ার পিছনে না ঘুরে খুঁজতে হবে ঈশ্বর প্রদত্ত আলোর পথ। একবার আলোর পথের সন্ধানে নামলে, তবেই পাওয়া যাবে পথে পথে আলোর দিশা। শুধু অন্বেষণ জারি রাখতে হবে... ■

মায়া

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)

মাঝে মাঝেই যখন ওরা হাতছানি দেয়,
বিমুগ্ধ নাকি প্রলুব্ধ জানিনা,
বিদগ্ধ হিয়াও কেমন যেন বিবশ হয়ে যায়।
মোহাবিষ্ট অবয়বখানি নিয়ে
নিজের অজান্তেই নীচে নেমে যাই...

তারপর আবার অন্তরে বাহিরে
অন্তহীন সংঘর্ষ...
অজস্র ক্ষতচিহ্ন নিয়ে চূড়াপানে চেয়ে থাকা
আর সমাপ্তপ্রায় অপরাহ্নের সংশয় বুকে নিয়ে
অহর্নিশ চরাই-এর লড়াই...

বাতাস ভরসা দিলো কই?
শুধু সুগভীর আঁধারের আহ্বান...
যতবার জিতেছি যুদ্ধে, হার হয়েছে তার বহুগুণ...
বুঝি সব, তবু কেন যেন ভালবাসি অধোগামিতা!
এবারেও কি ফিরতে হবে এই অনাদি নেশাতেই বুঁদ হয়ে? ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

তবুও মন চায়

নাহার আলম

তখন ছিলো কেবলমাত্র একটা জলজ সংসার।
হায়েনার হামলায় সব ভেঙেচুরে একাকার!
চেয়েছিলাম সুধীর ছায়ার এক স্থাপনা হোক,
নির্ভেজাল কোটিবার।
দুরন্ত ক্রোধ শিখরে হেঁটে চলে যায় আনকোরা সব স্লোগান।
সমঝোতার আঁচল পেতে একত্র করেছিলাম
শান্ত লোকালয় আর ফুলের জমাট বাগান।

যখন ছিলাম – এক অন্য রকম আমি,
বিপ্লবী নই মানবিক প্রেমী।
যখন ছিলো বাসের চারিধারে বহমান চপলা নদীজল,
সুজন আর পাখির কোলাহল।
ছিলো আরও ফুলপাতা অরণ্যের ছায়াময় মায়ার ভুবন।

কী যে হলো অকস্মাৎ!

ঝড় তাড়িত মেঘের মতো ফুৎকারে বিলীন হলো সবই!

ঠিক তখনই নিজেকে আমি আলাদা করে ভাবতে
শিখেছিলাম – হয়ে নিলাম ‘কবি'।
এখন শুধু চিঠি লিখি কবিতায় কবিতায় প্রাপকহীনের
ঠিকানায়।
জানি, পৌঁছোবে না কোনোদিন, উড়বে হেঁয়ালি হওয়ায় –
অজানায়।

তবুও...
পুঁতে দিতে মন চায় ঠিক;
একটিমাত্র স্বচ্ছ ধ্বনি, একটিমাত্র ভালো কথা,
একটিমাত্র জমাট ব্যথা...
‘আমরা গড়বো, সকলেই লড়বো– সততাই হোক আমাদের
একমাত্র হাতিয়ার।'

জানি না, পারবো কি পারবো না –
তবুও বলে যেতে মন চায় –
খুব চায়... ■

আর্দ্র্য অভিমান

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

ওকে আলাদা করে বলা হয়নি সাদা ফুল ভালো লাগে। সাদা ফুলের মধ্যে গন্ধরাজ খুব প্রিয়, কিন্তু রজনীগন্ধা সহ্য করতে পারিনা। ও এসেছে সবার পেছনে, রজনীগন্ধার মালাগুলো সরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে আমায় গন্ধরাজে। ও জানলো কি করে! আমি তো বলিনি ওকে কোনদিন। আমার সত্যির মধ্যে লুকিয়ে থাকা মিথ্যে আর মিথ্যের ভীড়ে লুকিয়ে থাকা সত্যের নির্যাস – ও খুঁজে বেড়িয়েছে সারাটা জীবন...

আর একটু পরেই তো ঐ চিতার আগুনে পুড়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাবে আমার এই দেহটা। যারা কোনদিনই আমায় সহ্য করতে পারেনি, তারাও করবে আমার গুণের প্রশংসা। গুণ! কি অদ্ভুত একটা শব্দ! শব্দটা বড় আঘাত করছে আমায়... উঃ! কি সাংঘাতিক লাগছে কথাটা... এই যে দেহটা শুয়ে আছে সরু একটা বাঁশের মাচায়, সে তো কোনদিন গুণ কথাটা শোনেনি। একটা তাচ্ছিল্য সব সময় তাকে ঠেলে বেড়িয়েছে। কি ছিলো এর!

সকালে দুধ চায়ে এলাচ আর আদা মেশালে, কফি ছেড়ে এ সেটাই খেত। বিছানা করে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মতো মশারির মধ্যে মশাদের থেকে নিজেকে আগলে রাখত। এর বাইরে! হ্যাঁ, এর বাইরেও ছিল ওর কাছে এর (অর্থাৎ আমার) গাফিলতিগুলো চারা

গাছ থেকে মহীরুহ হয়ে ওঠা। আর কোন কিছু চোখে পড়েনি ওর...

নৌকার পাল, গঙ্গার ঘাট, ভাঁড়ের চা আর ব্যর্থতার চিকলেট চিবোতে চিবোতে আগলে রাখা কিছু স্মৃতি, এই তো ছিলো আমার মূলধন। আমি তো জয় করেছি সব। তবে কেন ওর শুষ্ক গালে অশ্রুর ট্রাম লাইন পাতা?

##

একটু একটু করে ছাই হয়ে যাচ্ছে আমার নশ্বর দেহটা। কার কথায় ওর ঠোঁটে মোনালিসা হাসি! আর তো একটা বছর। স্মৃতিগুলো হবে ডিজেল বর্ণ। অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য হয়তো বলবে, আজও ঘুমিয়ে পড়লে ও স্বপ্নের মধ্যে বেড়াতে আসে... ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/
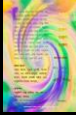
পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২১

https://online.fliphtml5.com/osgiu/wlch

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ymfp

https://online.fliphtml5.com/osgiu/kabb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/inhj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/nmnj

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ckkh

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tlro

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ehsn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ogbi

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zrsw

https://online.fliphtml5.com/osgiu/iirn

https://online.fliphtml5.com/osgiu/uuyz

পাঠকদের সুবিধার্থে

নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা 'গুঞ্জন'-এর ২০২১ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।

জীবনী

সামিমা খাতুন

স্বপ্নগুলো সত্যি হলে,
গল্প বলি খেলাচ্ছলে।
হারতে থাকা তপ্ত দিনে,
পুড়তে হল কোন আগুনে?
ক্ষত সারায় আপনজনে,
না জর্জরিত বাক্য বাণে?
চোখের জলের নোনতা স্বাদ,
ভোলায় যত শখ-আহ্লাদ।

নিজের লড়াই নিজের সনে,
মনেরই কোনো গোপন কোণে।
সাহস দেয় রাতের তারা,
ছোট্ট কণা মিটমিট করা।
আকাশ ছুঁতে একলা হলে,
এগিয়ে যাও ভয়কে ফেলে।
ছড়িয়ে পড়া মনের বল,
চলার পথে শেষ সম্বল।
হাজার আলাপন করে সমঝোতা,
উত্তর দেয় নির্জন নীরবতা,
ইচ্ছেগুলো মেললে ডানা,
হারিয়ে যেতে নেইতো মানা।। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২২

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ialo

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eusb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tath

https://online.fliphtml5.com/osgiu/zkwb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lnps

https://online.fliphtml5.com/osgiu/gqaz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/noyb

https://online.fliphtml5.com/osgiu/oomz/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eoat/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/ubpb/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/rvpr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/fbyc/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'-এর ২০২২ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ **পিঁপড়ার বাসা...**

চিত্রগ্রাহকঃ **প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)**

ছবির নামঃ **ভয়ঙ্কর সেই গাছটা...**

চিত্রগ্রাহকঃ **প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পিকে)**

অন্নপূর্ণার প্রতীক্ষা

ডঃ মালা মুখার্জী

কাশীর গোধূলিয়ায় আর যে কয়েকটি পুরোনো বাঙালী বাড়ী অবশিষ্ট আছে, তার মধ্যে এই বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী অন্যতম। তবে এই তিনতলা বাড়ীর এখন না আছে জৌলুস, না সেরকম যত্ন, তবুও লাল ইঁটের পাঁজরটা পুরোনো গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতীত কালের সাক্ষী হয়ে। এই পুরোনো বাড়ীটায় আজ একটু বেশীই ব্যস্ততা। ষাটোর্দ্ধ গৃহিনী অপরাজিতাদেবী প্রতিবারের মতো এবারেও অন্নপূর্ণা পুজোর আয়োজন করেছেন। পারিবারিক পুজো, তবে ছেলেরা কাছে থাকে না বলে অন্যবার নমো নমো করে হয়, এবারে দুই ছেলেই আসছে তাদের পরিবার নিয়ে, তিনিই ডেকে পাঠিয়েছেন, কারণ, বিষয়টি গুরুতর।

কেয়ারটেকার ভৈরবদাদা মানে ভৈরোঁ সিং এয়ারপোর্টে গেছেন ওদের আনতে। তাঁর দুই সর্বক্ষণের সঙ্গীদের মধ্যে জয়া এখনও পুজোর যোগাড়ে ব্যস্ত, দশটা বাজলেই ঠাকুরমশাই এসে পড়বেন।

"মা, গিজারের জলটা গরম হয়ে গেছে, চলো নেয়ে আসবে," বিজয়া বলল।

আরও আগেই হয়তো অপরাজিতা দেবী স্নান সারতেন, কিন্তু মার্চের শেষেও বারাণসীতে হাল্কা শীতের আমেজ থাকে,

যা তাঁর বয়সের জন্য ক্ষতিকারক, তাই কাকভোরে স্নান করতে ভয় পান আজকাল।

"চল, আমি নেয়ে না এলে তো হাত লাগাতেও পারছি না, জয়া একা কতই বা করবে বল? তুইও তো হাত লাগালি না!" গৃহকর্ত্রীর ধমক শুনে বিজয়া কাচুমাচু মুখে বলল, "কী করবো মা? সোয়ামী সাথে থাকুক আর নাই থাকুক, এক চিলতে সিঁদুর সিঁথিতে না থাকলে মেয়েমানুষ মঙ্গলকাজে হাত লাগাতে পারে না... আমি তো আর তোমার মতো অত শিক্ষিত নই..."

অপরাজিতাদেবী থমকে গেলেন, তাঁর এই সবসময়ের সঙ্গীনি দুজনের জীবন খুব সুখকর নয়। জয়া ওরফে জয়িতা বিহারের মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী থেকে 'বাঁজা' অপবাদ নিয়ে ঘর ছেড়েছিল, ভাইদের সংসারে জায়গা হয়নি, কাশীতে এসেছিল খেটে খাবে বলে। অপরাজিতাদেবী তখন সদ্য সদ্য হাউজওয়াইফের তকমা ছেড়ে একটা এনজিও স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে জয়েন করেছেন, বাড়ীতে দুই ছেলে, একজন যোলো, আর একজন চোদ্দো; মরিয়া হয়ে দিনরাতের লোক খুঁজছিলেন, ভৈরোঁ সিং জয়ার খোঁজ এনে দিয়েছিল, ওর গ্রাম সম্পর্কে ভাইঝি হয়।

বিজয়ার কাহিনী একটু ভিন্ন, ও অল্পবয়সে বিধবা, কোনো বাড়ীতেই জায়গা না হওয়ায় কাশীতে এসেছিলো, এনজিওর স্কুলে সেলাই আর কম্পিউটার শিখতো।

আজ বিজয়ার কথাগুলো অপরাজিতাদেবীর মরমে লাগলো, স্বামী সাথে থাকুক বা না থাকুক, সিঁথির এই সিঁদুরের জন্যেই মেয়েরা মঙ্গলাচারে অংশ নিতে পারে। আজকের পর থেকে

তিনিও কী এসবের ওপর থেকে অধিকার হারাবেন? সামনের বুধবার, মানে পরশু দিন তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার বারো বছর হবে। বারো বছর ধরে কেউ নিখোঁজ থাকলে তাকে শাস্ত্রীয়ভাবে মৃত মানা হয়। এমনই এক চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নিরুদ্দেশ হয়ে যান। কেন? কেউ জানে না...

বরাবরই বড়লোক ব্যারিষ্টার বাবার ছেলে আশুতোষ বাউণ্ডুলে মার্কা ছিলো। তবুও পিতা জনার্দন বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো ত্রুটি রাখেননি, ছেলে আইন পড়া অসমাপ্ত রেখে শিল্পী হতে চাইলো, তিনি জোর করে ছেলের বিয়ে দিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী মেয়ে অপরাজিতার সঙ্গে। অপরাজিতার রূপে তাঁর বাউণ্ডুলে ছেলে সাময়িক মজলেও, দ্বিতীয় সন্তান হওয়ার পর আবার তার বাউণ্ডুলেপনা চাগাড় দিয়ে উঠলো।

শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে অপরাজিতাদেবী সেদিনের কথা মনে করবার চেষ্টা করলেন। আর্ট গ্যালারিতে আশুতোষ ব্যানার্জীর ছবির প্রদর্শনী চলছে, শ্বশুরমশাই ভালোই টাকা ইনভেষ্ট করেছিলেন, তাই, বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি অতিথি হয়ে এসেছেন, এঁরা আর্টের সমঝদার নাহলেও স্ট্যাটাস দেখাতে আর্টিস্টের পৃষ্ঠপোষক হতে জানেন। তাই ছবি বিক্রিও ভালোই হচ্ছিলো। আশুতোষের কোনো কোনো ছবি হয়তো আজও লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর কিছু কিছু অভিজাত গৃহের ড্রয়িংরুমে বা লিভিংরুমে পাওয়া যাবে, কিন্তু যে ছবি সেদিন বহু অনুরাগীর নজর কেড়েছিলো, তা হলো এক শ্যামাঙ্গী তন্বী সুন্দরীর নদীতে স্নানের দৃশ্য, সন্ধ্যাকালে সে স্নান করছে, তীরে প্রদীপ নিয়ে যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে সেই

সুন্দরীর তীক্ষ্ণ মুখশ্রী। একদম মেদবর্জিত দেহ, সাদা লালপেড়ে কাপড় পরা দীর্ঘকেশী, দীঘল নয়না সুন্দরী! ছবির নাম 'গঙ্গা'! এ পর্যন্ত ঠিকই ছিলো, শিল্পী তাঁর কল্পনায় কত কী ভাবতে পারেন! কিন্তু আশুতোষ বললেন, "গঙ্গা আমার কল্পনা নয়, সত্যি!"

সেদিন গঙ্গা এসেছিলো প্রদর্শনীতে, কিছুট জড়োসড়ো হয়ে, ভালো নাম জাহ্নবী কুমারী, মণিকর্ণিকার শশ্মানে ডোমের মেয়ে। ছি-ছি পড়ে গিয়েছিল অভিজাত পাড়ায়, অপরাজিতা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ওই তাল ঢ্যাঙা মেয়েটার মধ্যে এমন কি আছে, যা আমার নেই?"

"তুমি ভুল বুঝছো, গঙ্গার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। একজন মডেল শিল্পীর অনুপ্রেরণা হতে পারে, গৃহে তো অন্নপূর্ণাই থাকে, আর দিনশেষে তার দ্বারেই আসতে হয় পুরুষকে..."

"দয়া করে এসো না! থাকো তোমার শৈল্পিক কল্পনাকে নিয়ে"... আশুতোষ নির্বাক থাকেন, পরদিন আর তাঁকে পাওয়া যায় না। দীর্ঘ বারো বছর অতিবাহিত হয়েছে, তাঁর কোনো খোঁজ নেই, খোঁজ নেই মেয়েটিরও; অনুতপ্ত শ্বশুরমশাই অপরাজিতাকে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার দিয়ে গত হয়েছেন একদশক হলো, শাশুড়ীতো আশুতোষের বাল্য কালেই গত হয়েছিলেন, অপরাজিতার জীবন-যুদ্ধ সেদিন থেকে শুরু হয়েছিলো 'সিঙ্গল মাদার' হিসাবে!

স্নান সেরে পাটভাঙ্গা তসরের লালপেড়ে শাড়ীটা পড়লেন অপরাজিতা, হয়তো বা এইই শেষবার! বিজয়ার খেয়াল আছে সবদিকে, সিঁদুরের কৌটো আর আলতার শিশিটাও এনে রেখেছে সে। আজ কোন খেয়ালের বশে তিনি আলমারীর ভল্টটা

খুললেন, বিয়ের সব গয়নাগুলো এখানেই আছে। শেষবারের মতো হলেও অপরাজিতাদেবী গয়নাগুলো পরলেন। আয়নায় নিজেকে দেখলেন, কাঁচাপাকা চুল কোমর ছাপিয়ে নেমেছে, সিঁথিতে সিঁদুর, গলায় হার, নাকে নথ, কানে কানপাশা, হাতে চুড়, সব এখনো আগের মতোই লাগছে, শুধু যার জন্য শৃঙ্গার সে নেই। "কি দেখেছিলেন ওই মেয়েটার মধ্যে?" ফিসফিসিয়ে অপরাজিতা আয়নাকে জিজ্ঞেস করেন, আয়না নীরব রইলো, শুধু তাঁর প্রতিবিম্ব ফুটে রইলো।

সবকটা গয়না পরা শেষ হওয়ার আগেই নীচে গাড়ীর আওয়াজ পাওয়া গেল, আর অনেক মানুষের গলা। অপরাজিতা হাসলেন, প্রমথেশ আর সমরেশ, তাঁর দুই ছেলে, তাঁর বুকের পাঁজর এসে গেছে, সঙ্গে বড় বৌমা রিঙ্কিমা, নাতি শুভময়। সমরেশ এখনও বিবাহিত নয়, হয়তো শিগগিরই করবে। তিনি জানলার ঘুলঘুলি ফাঁক করে দেখলেন, তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম হলে অন্নপূর্ণা ঠাকুরের মূর্তির সামনে হাসিমজা করছে, এরাই তো তাঁর আসল গয়না!

অপরাজিতা দেবী তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। তাঁর দুই সন্তান, নাতি, বৌমা তাঁরই অপেক্ষায় ছিলো। রিঙ্কিমা প্রণাম করতে গেলে তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। "জগন্মাতার সামনে প্রণাম নয়, মা..."

"আপনাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে মা, একদম মা দুর্গার মতো..." রিঙ্কিমা শাশুড়ীকে বলল।

"দেবীর সামনে আমার প্রশংসা নাই বা করলে, চলো পূজাস্থলে যাই দেখি..."

দুর্গাদালানে পুজো জমে উঠেছে, হোম চলছে, জয়া সবকিছু হাতে হাতে যোগাড় দিচ্ছে। তারই মধ্যে বিজয়া ছেলেদের শরবত আর মিষ্টি দিয়েছে, রিঙ্কিমা কিছু খায়নি, অঞ্জলি দিয়ে খাবে। অপরাজিতার গর্বে বুক ভরে উঠছিলো, আজ তাঁর যোগ্য প্রজন্ম সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। কয়েকমাস যাবত তিনি শুধু ভৈরবদাদার কথায় বিশ্বাস করেছেন, তারপর যেদিন সত্যিটা দেখেছেন সেদিন কেঁদে ফেলেছেন। গঙ্গার ঘাটে এক নতুন ভিখারী এসেছে, তার মুখ তাঁর স্বামীর সাথে মেলে। তাঁর ভুল হতে পারে, ভৈরোরও বয়স হয়েছে, কিন্তু বড়ছেলে প্রমথেশেরও কী চিনতে ভুল হবে? চিঠিতে সেকথা লিখেই দুই ছেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

যথানিয়মে পুজো শেষ হলো। এবার কাঙালীদের ভোজন। বহু আশা নিয়ে অপরাজিতাদেবী এগিয়ে গেলেন সেই অপ্রকৃতস্থ মানুষটির দিকে। পাতে পরমান্ন পড়তেই তিনি এমনভাবে খেতে লাগলেন যেন কতদিন খাননি।

"ইনি বাবা নন মা, তুমি আর মিথ্যে আশায় থেকো না। বাড়ীটা বেচে দাও, মুম্বাইয়ে আমার বড় তিন কামরার ফ্ল্যাট, তাছাড়া সমরেশও বেঙ্গালুরুতে একা হাত পুড়িয়ে খায়," প্রমথেশের কথা শুনে অপরাজিতাদেবী থমকে গেলেন।

"হ্যাঁ মা, প্রোমোটারের ভালো অফার আছে," রিঙ্কিমা বললো, "তুমি এত দামী গয়নাগুলো নিয়ে একা পোড়োবাড়ীতে থেকো না, ওগুলো লকারে রাখো। আজকাল নিরাপত্তা কোথায়?"

"আমি একা কোথায় রে? জয়া রয়েছে, বিজয়া রয়েছে, তোদের ভৈরব দাদা রয়েছেন..."

"ভৈরবদাদা বুড়ো হয়েছেন," সমরেশ বলল, "তাছাড়া দুজন অনাত্মীয় নামগোত্রহীন মহিলার ওপর কী ভরসা করে ছাড়া যায় তোমায়? দেখছো তো, কীরকম ভাবে একজন পাগলকে বাবা সাজিয়ে..."

"ব্যস..." অপরাজিতাদেবী বলে উঠলেন, "আমি বেঁচে থাকতে শ্বশুরের ভিটে বেচতে দেবো না, আমার সঙ্গীরাও এখানেই থাকবে। এ বাড়ী আমার, তাই আমার কথাই শেষ কথা।" মাকে এত রাগতে ছেলেরা কখনো দেখেনি।

অপরাজিতা আর কারও কথা না শুনে ভোগের থালা হাতে সেই ভবঘুরের সামনে এলো, লুচি, কুমড়োর ছক্কা, ধোঁকার ডালনা সব কটাই আশুতোষের পছন্দের খাবার ছিল। খেতে খেতে ভবঘুরে একবার তাঁর মুখের দিকে চাইলো, "তুমি আজও তেমনই আছো, অপু..." অপরাজিতা হাসলেন, অপু নামটা আশুতোষের দেওয়া। "বিশ্বাস করো..."

আশুতোষকে থামিয়ে অপরাজিতা বললেন, "তুমি খাও, আমি জানি গঙ্গার সাথে তোমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, তবুও এমন দৃশ্য আঁকা তোমার উচিত হয়নি। সেও জলে ডুবে মরেছিলো। তুমিও অপরাধবোধে দেশান্তরী হলে। ভৈরবদাদা সব বলেছে।"

"আমাকে ক্ষমা করো, আমি ভুল করেছি...'

"ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা না করলে পাপ হয় যে," অপরাজিতা সোনার কাঁকন বাজিয়ে পরিবেশন করতে করতে বললেন। একটু দূরে মাটির প্রতিমা যেন জীবন্ত হয়ে হাসছে, আজ এ বাড়ীর অন্নপূর্ণার সব প্রতীক্ষার অবসান হলো... ■

https://www.facebook.com/groups/183364755538158

সবিনয় নিবেদন

'গুঞ্জন' কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা 'গুঞ্জন'-এ দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের 'ই-মেল'-এ (contactpandulipi@gmail.com) পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু'ট 'ফরম্যাট'-ই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি 'পাসপোর্ট সাইজ'-এর ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর **'পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)'** গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: জুলাই ২০২৪ সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ই জুলাই, ২০২৪

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) ‘গুঞ্জন’ এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।

আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com

২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।

৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা ‘গুঞ্জন’ এর জন্য পাঠাবেন না।

৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।